সাইয়েদ হোসাইন নাসর

মানুষ ও প্রকৃতি

আধুনিক মানুষের আধ্যাত্মিক সংকট

অনুবাদ :

মুশফিকুর রহমান

ইসলামী চিন্তা ও গবেষণা ইন্সটিটিউট
معهد التفكر والبحوث الإسلامي
Institute of Islamic Thought and Research

আমাদের কথা

প্রফেসর ড. সাইয়েদ হোসাইন নাসর মুসলিম উম্মাহর প্রখ্যাত আলেম, দার্শনিক ও মুতাফাক্কির। সমকালীন ইসলামী দর্শন, তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব ও বিজ্ঞান দর্শনের ক্ষেত্রে তাকে অন্যতম অথরিটি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ইসলামী দর্শন, তাসাউফ, মেটাফিজিক্স, ইসলামে বিজ্ঞান দর্শন, পরিবেশ-চিন্তা, শিল্পকলা এবং আধুনিকতার সমালোচনামূলক বিশ্লেষণসহ নানাবিধ বিষয়ে প্রগাঢ় অধিকারের জন্য তিনি সুপরিচিত। আধুনিক কালে ইসলামী জ্ঞানতাত্ত্বিক ঐতিহ্যকে পুনরুজ্জীবিত করা এবং পশ্চিমা আধুনিকতার প্রেক্ষাপটে ইসলামী সভ্যতার ঐতিহ্যসমৃদ্ধ জ্ঞানব্যবস্থার গুরুত্ব তুলে ধরার ক্ষেত্রে তার অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সাইয়েদ হোসাইন নাসর ১৯৩৩ সালে তেহরানে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা ছিলেন একজন চিকিৎসক ও শিক্ষাবিদ, যার কাছেই তার প্রাথমিক পড়াশোনার হাতেখড়ি। পরবর্তীতে তিনি উচ্চশিক্ষার জন্য যুক্তরাষ্ট্রে যান এবং Massachusetts Institute of Technology-এ পদার্থবিজ্ঞান অধ্যয়ন করেন। পরবর্তীতে তিনি হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিজ্ঞানের ইতিহাস ও দর্শনে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। পশ্চিমা দর্শন এবং ইসলামী দার্শনিক ঐতিহ্যের উপর তার প্রগাঢ় অধিকার তার বিশিষ্ট চিন্তাভাবনাকে বহুমাত্রিকভাবে হাজির করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

একজন বহুপ্রজ দার্শনিক ও বহুভাষী চিন্তাবিদ হিসেবে নানান বিষয়ে নাসর লিখেছেন। দর্শন থেকে সাহিত্য, তাসাউফ থেকে বিজ্ঞান, শিল্প থেকে ইতিহাস নানান বিষয়ে তিনি অনবরত লিখেছেন। তার রচিত গ্রন্থের সংখ্যা ৫০ এর অধিক, এবং গবেষণা প্রবন্ধের সংখ্যা ৫ শত এর

অধিক। বর্তমানে সাইয়েদ হোসাইন নাসর যুক্তরাষ্ট্রের জর্জ ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটিতে-এ ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে অধ্যাপনা করছেন। তিনি এখনো সক্রিয়ভাবে লেখালেখি, বক্তৃতা ও বিভিন্ন আলোচনায় অংশগ্রহণ করছেন এবং বিশ্বব্যাপী ইসলামী চিন্তা ও সভ্যতার ধারণাকে তুলে ধরার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছেন।

প্রায় শতবর্ষী এ বহুপ্রজ দার্শনিকের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি গ্রন্থ হলো *Man and Nature: The Spiritual Crisis in Modern Man*। সত্তরের দশকে নাসরের এ গ্রন্থটি এক অর্থে বস্তুবাদী পশ্চিমা সভ্যতার বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি ও বিজ্ঞান দর্শনের ভিত নাড়িয়ে দিয়েছিলো। গুরুত্বপূর্ণ এ গ্রন্থটি এককথায় মেটাফিজিক্স এবং পাশ্চাত্যের তৈরিকৃত বস্তুবাদী জগতে মেটাফিজিক্সের প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন কীভাবে সম্ভব তার উপর লিখিত। নাসর দেখিয়েছেন, মেটাফিজিক্স ও আখলাক থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে পাশ্চাত্য যে কথিত আধুনিকতা তৈরি করেছে, তার বাইপ্রোডাক্ট হলো 'আধুনিক মানুষ' যারা কিনা জীবনের সকল ক্ষেত্রে ভয়াবহ আধ্যাত্মিক শূন্যতা ও প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্যহীনতার সংকটে বিপর্যস্ত ও জর্জরিত।

নাসর বলতে চেয়েছেন, আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা থেকে উদ্ভূত নাস্তিকতা, অজ্ঞেয়বাদ কিংবা অধুনা মানুষের ভয়াবহ আধ্যাত্মিক শূন্যতা স্রেফ প্রযুক্তি কিংবা যান্ত্রিক জীবনযাপনের ফলাফল নয়। বরং, পাশ্চাত্য মহাবিশ্বকে দেখার যে দৃষ্টিভঙ্গি এবং দার্শনিক চোখ তৈরি করেছে, এগুলো তারই ফলাফল মাত্র। ফলত, নাসর এককথায় আজকের দুনিয়ার সংকটের একধরনের গভীর পাঠের ভেতর দিয়ে গেছেন, যেখানে তিনি কেবল সংকট নিয়ে আলোচনা করেই ক্ষান্ত থাকেননি, বরং সংকট উদ্ভূত হওয়ার কারণগুলো নিয়ে আলোচনা করেছেন।

অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এ গ্রন্থটি বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেছেন তরুণ অনুবাদক ও চিন্তক মুশফিকুর রহমান। ইতিপূর্বে তার অনূদিত প্রফেসর ড ইউসুফ আল কারযাভীর গ্রন্থ *মুমিন জীবনে ঈমানের প্রভাব* পাঠকপ্রিয়তা পেয়েছে। এছাড়া রোয়াক ব্লগেও তিনি বেশকিছু প্রবন্ধ অনুবাদ করেছেন। দ্বিতীয় অনুবাদ হলেও, অত্যন্ত জটিল এ গ্রন্থটির আলোচনা খুবই সাবলীলভাবে তুলে ধরেছেন তিনি।

উত্তর আধুনিক সময়ে এসে পাশ্চাত্যের প্রস্তাবিত সমাধানসমূহ যখন প্রমাণিত হয়েছে অযৌক্তিক ভ্রমে, পাশ্চাত্যের বিশ্বব্যবস্থা যখন মানুষকে তার ন্যূনতম অধিকারের পরিবর্তে কায়েম করেছে নব্য আধিপত্য ও শোষণমূলক ব্যবস্থা, মানুষের ভেতরকে অন্তসারশূন্য করে মানুষকেও নিয়ন্ত্রণ করতে চেয়েছে যন্ত্রের মতো– তখন এই গ্রন্থটির প্রয়োজনীয়তা ও প্রাসঙ্গিকতা অন্য যেকোনো সময়ের চেয়ে বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। নাসরের ক্ষুরধার আলোচনা ও দার্শনিক উপলব্ধি এবং অনুবাদকের পরিশ্রমের মিশেল গ্রন্থটির বঙ্গানুবাদকে সুখপাঠ্য করেছে।

চিন্তাশীল পাঠকদের জন্য আবশ্যক এ গ্রন্থটি ইসলামী চিন্তা ও গবেষণা ইন্সটিটিউটের প্রকাশনা বিভাগ থেকে প্রকাশ করবার উদ্যোগ নিয়েছি। আশাকরছি, আমাদের এ প্রচেষ্টা ব্রিটিশ একাডেমিয়ার জ্ঞানতাত্ত্বিক উপনিবেশের জিঞ্জির থেকে আমাদের চিন্তা ও মানসকে মুক্ত করবার উসিলা হয়ে উঠবে ইনশাআল্লাহ।

সা'দ মুসান্না
জুন, ২০২৬
উত্তরা, ঢাকা

অনুবাদকের কথা

বিসমিল্লাহ; মানব সভ্যতার এমন একটা সময়ে আমরা আজ দাঁড়িয়ে আছি, যখন আমাদের চারপাশের পরিবেশ, প্রকৃতি ও জলবায়ু সংকট বিশ্বব্যাপী আলোচনার কেন্দ্রে অবস্থান করছে। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায় থেকে শুরু করে শতশত পরিবেশ বিষয়ক সংগঠন, দাতব্য কাজ কিংবা জাতিসংঘ পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানগুলোর ভিশনারি গোলসমূহ; সকলেই হন্যে হয়ে পরিবেশ ও প্রকৃতির ভারসাম্য আনয়নে কাজ করছে। কিন্তু তাদের এই কার্যক্রমের পুরো ক্ষেত্রটিই সীমাবদ্ধ রয়েছে প্রযুক্তি, উদ্ভাবন, অর্থনীতি কিংবা নীতিনির্ধারণের পরিসরে। অথচ মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্কের যে আধ্যাত্মিক, দার্শনিক ও নৈতিক ভিত্তি রয়েছে, তা প্রায়শই আলোচনার বাইরেই থেকে যায়। এই অভাবই আমাকে *Man and Nature: The Spiritual Crisis in Modern Man* গ্রন্থটির বাংলা অনুবাদের কাজে উদ্বুদ্ধ করেছে।

প্রখ্যাত মুসলিম চিন্তক ও দার্শনিক সাইয়েদ হোসাইন নাসর এই গ্রন্থে আমাদের স্মরণ করিয়ে দেন যে, পরিবেশ সংকট মূলত মানুষের অন্তর্জগতের সংকটেরই বহিঃপ্রকাশ। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্পর্ককে যদি কেবল উপযোগিতা ও ভোগের মানদণ্ডে বিচার করা হয়, তবে কোনো প্রযুক্তিগত সমাধানই স্থায়ী মুক্তি এনে দিতে পারবে না। এই দৃষ্টিভঙ্গিই গ্রন্থটিকে সমসাময়িক পরিবেশবিষয়ক সাহিত্য থেকে স্বতন্ত্র মর্যাদা দিয়েছে বলে আমি মনে করি।

অনুবাদের ক্ষেত্রে আমার চেষ্টা ছিলো মূল গ্রন্থের ভাব, দর্শন ও ভাষার গাম্ভীর্য যথাসম্ভব অক্ষুণ্ন রেখে বাংলা ভাষাভাষী পাঠকদের জন্য একটি সাবলীল ও প্রাঞ্জল পাঠ উপস্থাপন করা। কোথাও ভাষাকে অপ্রয়োজনীয়ভাবে জটিল

করিনি, আবার মূল লেখকের চিন্তার গভীরতাও যাতে ক্ষুণ্ন না হয়, সে বিষয়েও সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করেছি।

আমার বিশ্বাস, এই গ্রন্থটি কেবল পরিবেশ নিয়ে আমাদের নতুন করে ভাবতেই সাহায্য করবে না; বরং মানুষ, প্রকৃতি এবং মহান আল্লাহর সঙ্গে আমাদের সম্পর্ককেও নতুন দৃষ্টিতে উপলব্ধি করতে সহায়তা করবে। যদি এই অনুবাদ পাঠকের চিন্তাজগতে সামান্য হলেও নতুন প্রশ্নের জন্ম দেয় এবং সৃষ্টিজগতের প্রতি দায়িত্বশীলতার অনুভূতি জাগিয়ে তোলে, তবে একজন অনুবাদক হিসেবে আমার শ্রম সার্থক বলে মনে করবো।

আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে তাঁর মহান অস্তিত্বের ঐশ্বরিক সত্যকে উপলব্ধি করার এবং তাঁর সৃষ্টির প্রতি আমানতদার হিসেবে নিজেদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

মুশফিকুর রহমান

কাতোভিৎসে, পোল্যান্ড
জুন ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ
২ মুহাররম ১৪৪৮ হিজরি

লেখকের ভূমিকা

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

আমরা এমন এক সময়ে বসবাস করছি, যখন পৃথিবীর মানুষেরা প্রথমবারের মতো উপলব্ধি করতে শুরু করেছে যে প্রকৃতির বিরুদ্ধে পরিচালিত প্রতিটি অবিচার শেষ পর্যন্ত মানুষের নিজের অস্তিত্বের দিকেই ফিরে আসছে। নদী দূষিত হচ্ছে, বন উজাড়করণ চলছে, প্রাণের বৈচিত্র্য বিলুপ্ত হচ্ছে কিংবা জলবায়ুর ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে; এসব কেবলই এখন আর পরিবেশগত বিপর্যয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। এগুলো মানবসভ্যতার অন্তর্গত এক গভীর অসুস্থতার বহিঃপ্রকাশ হিসেবে আমাদের সামনে হাজির হয়েছে। আমাদের চারপাশের ভূ-প্রকৃতির এসব ক্ষতচিহ্ন আসলে মানুষের আত্মার ক্ষয়িষ্ণু অবস্থারই এক দৃশ্যমান রূপ।

আজকের আধুনিক সভ্যতা পরিবেশ সংকটকে সাধারণত প্রযুক্তিগত কিংবা অর্থনৈতিক সমস্যা হিসেবে বিবেচনা করতেই অভ্যস্ত। তাই সমাধানের ক্ষেত্রেও আমাদের দৃষ্টি সীমাবদ্ধ থাকে নতুন প্রযুক্তি, বিকল্প জ্বালানি, উন্নত প্রকৌশল কিংবা নতুন কোনো নীতিনির্ধারণে। এসব প্রচেষ্টা অবশ্যই মূল্যবান; কিন্তু এগুলো সত্যিকারের প্রাকৃতিক সংকটের উপসর্গ নিরাময়ের স্বল্প-চেষ্টা মাত্র। প্রকৃত প্রশ্নটি আরও গভীরে নিহিত। আমাদের কিছু মৌলিক প্রশ্ন দিয়ে এই সমস্যা সমাধানের কাজ শুরু করা উচিত। মানুষ কেন এমন এক জীবনব্যবস্থা নির্মাণ করলো, যা তাকে সীমাহীন ভোগ, অস্থিরতা এবং প্রকৃতির উপর অবিরাম আধিপত্য প্রতিষ্ঠার দিকে ঠেলে দিলো? কেন সে নিজের অন্তর্গত শূন্যতাকে বাহ্যিক ভোগের মাধ্যমে পূরণ করতে চায়? এই প্রশ্নগুলোর উত্তর না খুঁজে পরিবেশ সংকটের স্থায়ী সমাধান কস্মিনকালেও সম্ভব নয়।

আমার বিশ্বাস, পরিবেশের বর্তমান বিপর্যয়ের শিকড় মানুষের বিশ্বদৃষ্টির পরিবর্তনের মধ্যে নিহিত। যখন মানুষ প্রকৃতিকে আর ঐশী নিদর্শন হিসেবে না দেখে নিছক ভোগ্য বস্তু হিসেবে দেখতে শুরু করলো, তখনই ধ্বংসের বীজ রোপিত হলো। আধুনিক বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির অসংখ্য কল্যাণকর দিক রয়েছে, কিন্তু যখন বিজ্ঞান নিজেকে বাস্তবতার একমাত্র বৈধ ব্যাখ্যা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে চায় এবং অস্তিত্বের আধ্যাত্মিক মাত্রাকে অস্বীকার করে, তখন সে অনিচ্ছাসত্ত্বেও মানুষকে এমন এক জগতে নিয়ে যায় যেখানে প্রকৃতির আর কোনো অন্তর্নিহিত মর্যাদা অবশিষ্ট থাকে না।

কিন্তু ধর্মীয় ও দার্শনিক জ্ঞান আমাদের সম্পূর্ণ ভিন্ন এক দৃষ্টিভঙ্গি শিক্ষা দেয়। সেখানে প্রকৃতি কোনো নির্বাক বস্তু নয়, ভোগ্যপণ্যও নয়; বরং এটি মহান আল্লাহর এক জীবন্ত নিদর্শন। সৃষ্টিকে দেখে স্রষ্টাকে খুঁজে পাওয়ার ইলাহী পন্থা। প্রতিটি বৃক্ষ, প্রতিটি পর্বত, প্রতিটি নদী এবং প্রতিটি জীব তাঁর মহিমারই সাক্ষ্য বহন করে। এই উপলব্ধি মানুষকে কখনোই প্রকৃতির মালিক নয়, বরং তার বিশ্বস্ত অভিভাবক হিসেবে গড়ে তোলে। ফলে পরিবেশ ও প্রকৃতি রক্ষা আমাদের নিকট আর কেবল নৈতিক দায়িত্বের পর্যায়েই সীমাবদ্ধ থাকেনা, এটি আধ্যাত্মিক ও ইলাহী দায়িত্ব পর্যন্তও বিস্তৃত হয়ে যায়।

দুঃখজনকভাবে, পরিবেশ সংকটের আলোচনায় এই আধ্যাত্মিক মাত্রাটি সর্বদাই উপেক্ষিত থেকেছে। কখনো ধর্মসমূহকেই এই সংকটের জন্য দায়ী করা হয়েছে, আবার কখনো পরিবেশবাদকে এমন এক বিকল্প ধর্মে রূপ দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে, যার ভিত্তি কোনো দৃঢ় আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। এই উভয় দৃষ্টিভঙ্গিই আমাদের উপর আবির্ভূত প্রাকৃতিক সমস্যার মূল থেকে দৃষ্টি সরিয়ে দেয়। আদতে এর প্রকৃত সমাধান তো নিহিত রয়েছে ধর্মের গভীরতম শিক্ষায় ফিরে যাওয়ার মধ্যেই। সেই শিক্ষায় যা মানুষ, প্রকৃতি এবং স্রষ্টার সম্পর্ককে এক অবিচ্ছেদ্য ঐক্যের মধ্যে দেখেছে।

বিশেষ করে ইসলামী সভ্যতার নগরগুলোতে আমরা দেখেছি, তাঁরা প্রকৃতিকে কখনোই জড় পদার্থের সমষ্টি হিসেবে বিবেচনা করেনি। কোরআনের ভাষায় সমগ্র সৃষ্টি তো মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের তাসবীহ পাঠ করে। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে পৃথিবী মানুষের সীমাহীন ভোগের

ক্ষেত্র নয়। এটি বান্দার নিকট মহান আল্লাহর আমানত। ইসলাম বিশ্বাস করে যে মানুষের মর্যাদা তার আধিপত্যে নয়, বরং তার দায়িত্ববোধেই নির্ধারিত হয়। সে পৃথিবীর মালিকও নয়; সে পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধি, যার কাজ কেবল মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে একটি পূর্ণাঙ্গ ভারসাম্য রক্ষা করা। বিনষ্ট করা নয়।

এই গ্রন্থে আমি পরিবেশ ও প্রাকৃতিক সংকটকে কেবল সমসাময়িক রাজনৈতিক বা বৈজ্ঞানিক আলোচনার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখিনি। বরং এর মেটাফিজিকাল, দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক দিকগুলোর প্রতি ফিরে তাকানোরও চেষ্টা করেছি। আধুনিকতার উত্থান, মানুষের আত্মপরিচয়ের পরিবর্তন, ধর্ম ও বিজ্ঞানের সম্পর্কের রূপান্তর এবং প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির বিবর্তন; এসব বিষয় বিশ্লেষণ না করলে বর্তমান সময়ের প্রাকৃতিক সংকটগুলোর প্রকৃত কারণ বোঝা প্রায় অসম্ভব।

আমার উদ্দেশ্য কখনোই আধুনিক বিজ্ঞানকে অস্বীকার করা নয়, কিংবা অতীতকে রোমান্টিকভাবে মহিমান্বিত করাও নয়। বরং পুস্তকটির মাধ্যমে আমি এমন একটি সমন্বিত দৃষ্টিভঙ্গির আহ্বান জানাই, যেখানে যুক্তি ও হুকুম-আহকাম, বিজ্ঞান ও হিকমত, প্রযুক্তি ও আখলাক; পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী না হয়ে পরিপূরক ও অবিচ্ছেদ্য অংশ হবে। আসলে মানুষের জ্ঞান তো তখনই পরিপূর্ণ হয়, যখন তা বাহ্যিক জগতের অনুসন্ধানের পাশাপাশি অন্তর্জগতের সত্যকেও স্বীকার করে।

এই গ্রন্থের প্রতিটি অধ্যায় পাঠককে একটি মৌলিক প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করাতে চায়: আমরা কি প্রকৃতিকে ধ্বংস করছি, নাকি নিজের মানবিক সত্তাকেই ধ্বংস করছি? যদি পরিবেশ সংকট মানুষের অন্তরের সংকটের বহিঃপ্রকাশ হয়, তবে তার সমাধানও শুরু হতে হবে মানুষের অন্তরের সংস্কার থেকেই। এজন্য আমি বলতে চেয়েছি, আধুনিক মানসের আধ্যাত্মিক পুনর্জাগরণ ছাড়া পরিবেশগত পুনরুদ্ধার কখনোই পূর্ণতা লাভ করবে না।

আমার আশা, এই গ্রন্থটি পাঠককে কেবল পরিবেশ সম্পর্কে নতুন কিছু তথ্যই জানাবে না; বরং তাদের নিজেদের অবস্থান, নিজেদের জীবনযাপন এবং সৃষ্টিজগতের সঙ্গে নিজেদের সম্পর্ককে নতুন করে ভাবতে উদ্বুদ্ধ করবে। যদি এই আলোচনা আমাদের অন্তত এতটুকু উপলব্ধি করাতে

পারে যে প্রকৃতিকে রক্ষা করা মানে শেষ পর্যন্ত মানবিক সত্তাকেই রক্ষা করা এবং মহান আল্লাহর কর্তৃক আরোপিত ইলাহী দায়িত্ব পালন করা, তবেই এই প্রচেষ্টা সার্থক হবে।

সাইয়েদ হোসাইন নাসর

ওয়াশিংটন, ডিসি
অক্টোবর ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দ
রবিউল আউয়াল ১৪১০ হিজরি

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়

মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যকার সম্পর্কহীনতা; অস্তিত্বের সংকট ও সমস্যা ১৯

দ্বিতীয় অধ্যায়

মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যকার সীমাহীন দূরত্বের মেটাফিজিক্যাল ও ঐতিহাসিক কারণসমূহ ৫৪

তৃতীয় অধ্যায়

প্রকৃতি ও মেটাফিজিক্সের মধ্যকার সম্পর্ক ৮৮

চতুর্থ অধ্যায়

মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যকার বৈরী অবস্থান; কিছু পর্যবেক্ষণ ও করণীয় ১২৪

প্রথম অধ্যায়

মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যকার সম্পর্কহীনতা; অস্তিত্বের সংকট ও সমস্যা

বর্তমান সময়ে আধুনিক বিজ্ঞানের উৎকর্ষের সঙ্গে সঙ্গে তার থেকে সৃষ্ট নানাবিধ সংকট নিয়েও বহু গবেষণা হচ্ছে। কিন্তু খুব কমই এই পরিস্থিতির জন্য দায়ী বিভিন্ন ঘটনাপ্রবাহ ও ঐতিহাসিক কারণগুলো অনুসন্ধান করা হয়েছে। আমাকে যখন "যুদ্ধের তাৎপর্য ও মানব অস্তিত্বকে হুমকির মুখে ফেলে মানব মর্যাদা রক্ষার সংগ্রাম"–এই ধরনের বিষয়ে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য যখন আমন্ত্রণ জানানো হয়, তখনই আমি অনুভব করি, এসকল অস্থায়ী ঘটনা ও ফলাফল নিয়ে আলোচনা করার চেয়ে সেটির নীতিনির্ধারণ ও মূল কারণগুলো বিশ্লেষণ করাই অধিক উপযুক্ত হবে। এর মধ্যে রয়েছে সামাজিক ও মানবিক স্তরে নৈতিক আচরণ ও মূল্যবোধ বিকাশের সমস্যা; পাশাপাশি আধুনিক প্রযুক্তি ও বিজ্ঞান যেভাবে যুদ্ধকে একটি সর্বগ্রাসী অবস্থায় পরিণত করেছে, সেই প্রেক্ষাপটও। এজন্য আমি আমার আলোচনায় মানুষ ও প্রকৃতির সমসাময়িক সংঘাত থেকে উদ্ভূত যে সমস্যার মুখোমুখি আমরা আজ দাঁড়িয়ে আছি, সেটি স্পষ্টভাবে তুলে ধরবো; তারপর এ অবস্থার পেছনে কাজ করা অন্তর্নিহিত কারণগুলো অন্বেষণ করবো এবং যে নীতিগুলোর অবহেলা আধুনিক সময়ের এসকল সংকটকে তীব্রতর করেছে, সেগুলোর উল্লেখ করার চেষ্টা করবো।

আজ পশ্চিমা সংস্কৃতির যে যান্ত্রিক নগরজীবন সৃষ্টি হয়েছে, সেখানে বসবাসকারী মানুষদের সাথে প্রকৃতির কোনো সামঞ্জস্যতা নেই। ফলে স্বতঃসিদ্ধভাবেই এক অজানা শূন্যতায় দিনাতিপাত করেন এসব নগরীর মানুষেরা। এই একাকিত্ব ও হাহাকারের প্রধান কারণ হলো এক কৃত্রিম

পরিবেশের সৃষ্টি, যেখান থেকে প্রকৃতিকে যতদূর সম্ভব বাদ দেওয়া হয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে এসকল সমাজের ধর্মপ্রাণ মানুষেরাও প্রকৃতির আধ্যাত্মিক তাৎপর্যবোধ হারিয়ে ফেলেছে।[১] তাদের কাছে প্রকৃতির এই পুরো ক্ষেত্রটিই অর্থহীন এক 'বস্তু'তে পরিণত হয়েছে। একই সঙ্গে মানব অস্তিত্বের এই গুরুত্বপূর্ণ দিকটির বিলুপ্তির ফলে যে শূন্যতা তৈরি হয়েছে, তা আজ বিভিন্নরূপে মানুষের অন্তর থেকেই প্রকাশ পাচ্ছে; কখনো ভীষণ সহিংসভাবে, কখনো বা চরম হতাশায়। তদুপরি, প্রকৃতিকে যে আধিপত্যের মাধ্যমে দমন করে এই ধর্মনিরপেক্ষ ও অন্তঃসারশূন্য নগরজীবন গড়ে তোলা হয়েছে, সে আধিপত্যের কারণেই আজ সেই পুরো জীবনধারা ভয়াবহ হুমকির সম্মুখীন। ফলে মানুষ, প্রকৃতি ও বিজ্ঞানের মধ্যকার এই ভয়াবহ অসমতা আজ এক ভয়াবহ ও সর্বজনীন উদ্বেগের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।[২]

আমাদের প্রশাসনিক কাঠামোতে প্রকৃতির উপর মানুষের ক্রমবর্ধমান আধিপত্য নিয়ে যে সরকারি উচ্চবাচ্য ও তথাকথিত অগ্রগতির ঢোল পেটানো হয়, তা সত্ত্বেও অনেকেই মনে মনে বুঝতে পারছেন যে, এই যে প্রাসাদ নির্মিত হচ্ছে, তার ভিত্তি আসলে বালির উপর। মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে এক গভীর ভারসাম্যহীনতা তৈরি হয়েছে, যা প্রকৃতির উপর মানুষের যাবতীয় দৃশ্যমান বিজয়কেই হুমকির মুখে ঠেলে দিচ্ছে।

প্রকৃতির উপর মানুষের আধিপত্যের ফলে যে বিপদ ও সমস্যাগুলোর সৃষ্টি হয়েছে, আমাদের কাছে সেগুলো এতটাই সুপরিচিত যে আলাদা

---

১. "মহাজাগতিক উপাসনা কিংবা জগতের খ্রিস্টতাত্ত্বিক অংশগ্রহণের রহস্য আজ আধুনিক নগরজীবনে অভ্যস্ত খ্রিস্টানদের কাছে প্রায় দুর্বোধ্য। ধর্মীয় অভিজ্ঞতা আর মহাবিশ্বের প্রতি উন্মুক্ত নয়; বরং তা ক্রমেই একটি সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় পরিণত হয়েছে। মুক্তি বা পরিত্রাণের প্রশ্নও মূলত মানুষ ও তার সৃষ্টিকর্তার মধ্যকার সম্পর্কের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। সর্বোচ্চ যা স্বীকার করা হয়, তা হলো মানুষ কেবল সৃষ্টিকর্তার কাছেই নয়, ইতিহাসের কাছেও দায়বদ্ধ। কিন্তু মানুষ, সৃষ্টিকর্তা ও ইতিহাসের এই সম্পর্কের মধ্যে মহাবিশ্বের কোনো স্থান অবশিষ্ট নেই। ফলে মনে হয়, এমনকি একজন আন্তরিক খ্রিস্টানের কাছেও পৃথিবী আর ঈশ্বরের সৃষ্টিকর্ম ও প্রকাশ হিসেবে অনুভূত হয় না।" মির্চা এলিয়াদে, *পবিত্র ও অপবিত্র: ধর্মের প্রকৃতি*, নিউ ইয়র্ক, ১৯৫৯, পৃ. ১৭৯।

২. গত দুই-তিন দশকে প্রকৃতিবিদ, দার্শনিক, সমাজবিজ্ঞানী, স্থপতি ও অন্যান্য পেশার মানুষেরা মানুষের নিজের জন্যই প্রকৃতির উপর আধিপত্যের বিপদ নিয়ে অনেক সমালোচনা করেছেন। লুইস মামফোর্ড ও জোসেফ উড ক্রুচের লেখাগুলো এই ধরনের সাহিত্যের দুটি সুপরিচিত কিন্তু পরস্পর ভিন্ন দৃষ্টান্ত, যা একভাবে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে এক শতাব্দী আগে উইলিয়াম মরিস ও জন রাস্কিনের উদ্বেগগুলোর প্রতিধ্বনি করে।

করে ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। আমাদের আজকের আধুনিক সমাজে বসবাসকারী মানুষের কাছে যেন প্রকৃতি তার নিজস্ব পবিত্রতাই হারিয়ে ফেলেছে। তার কোন প্রাণসত্তা নেই, ঘ্রাণ নেই; আছে শুধু কিছু রঙ ও চাকচিক্যের ভুই-ফোঁড়। ভাবতেও অবাক লাগে, আধুনিক সমাজ এই ভূপ্রকৃতি ও সৌন্দর্যকে এতটাই নিজেদের স্বার্থে ব্যবহারের জন্য মত্ত হয়েছে যে, তার সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য ফুল এবং সুন্দর-সদৃশ বিষয়সমূহ জেনেটিক্যালি মোডিফাই করে আমাদের চারপাশে প্রস্ফুটিত করছে। যদিও এই পুরো প্রক্রিয়াটি কেবল অল্প কিছু মানুষই উপলব্ধি করতে পারে।[৩] তদুপরি, প্রকৃতিকে এমন এক নিছক 'বস্তু' হিসেবে দেখা শুরু হয়েছে, যার সর্বোচ্চ ভোগ ও ব্যবহারই যেন কেবল একমাত্র লক্ষ্য। এই চূড়ান্ত মানসিকতা এমন এক বিপদজনক ও ঘৃণ্য মানসিকতায় আমাদের নিয়ে পৌঁছেছে যে এর উদাহরণ এভাবে দেওয়া যায়, আধুনিক পৃথিবীতে প্রকৃতি মানুষের কাছে বিবাহিত স্ত্রীর মতো নয়, যাঁর কাছ থেকে পুরুষ উপকার পায়, আবার একইসাথে যাঁর প্রতি পূর্ণ দায়িত্বশীলও থাকে। বরং প্রচলিত আধুনিক মানসের নিকট প্রকৃতি হয়ে উঠেছে কেবলই এক "যৌনকর্মীর" মতো; যার থেকে কেবল লালসা পূরণ করা হয়, কিন্তু এর প্রতি কোনো দায়িত্ব বা কর্তব্যের বালাই নেই। সমস্যা হলো এই 'পতিত' প্রকৃতির অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছে যাচ্ছে যে এর ভোগও এখন আর সম্ভব হচ্ছে না। অনাদরে ও অবহেলায় প্রকৃতির এই বিসর্জিত যৌবন আমাদের কাছে আবর্জনার স্তূপে পরিণত হয়েছে। আর সেই কারণেই অনেকে আজ তার অবস্থান নিয়ে উদ্বিগ্ন হতে শুরু করেছেন অনেকটা বাধ্য হয়েই। কারণ আধুনিক মানসের লালসার "প্রকৃতি" যে বার্ধক্যে পৌঁছে যাচ্ছে।

আর ঠিক এই 'প্রকৃতির ওপর আধিপত্য'-ই সৃষ্টি করেছে জনসংখ্যা বিস্ফোরণ, 'শ্বাস নেওয়ার অবকাশ'-এর অভাব, নগরজীবনের ঘনত্ব ও সংকুলতা, সকল প্রকার প্রাকৃতিক সম্পদের নিঃশেষ, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের ধ্বংস, মানসিক রোগের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি, শিশুদের যান্ত্রিক শৈশব, সেইসাথে মহান স্রষ্টার সৃষ্টিতত্ত্ব দেখে ও অনুভব করে স্রষ্টার অস্তিত্ব খোঁজার

৩. 'সম্পূর্ণরূপে পবিত্রতাহীন প্রকৃতির অভিজ্ঞতা একটি সাম্প্রতিক আবিষ্কার; তদুপরি, এটি এমন একটি অভিজ্ঞতা যা আধুনিক সমাজের কেবল সমাজের নির্দিষ্ট একটি শ্রেণি বা বিজ্ঞানীদের মাঝে সীমাবদ্ধ। অন্যদের কাছে প্রকৃতি এখনো এমন একটি মোহ, রহস্য ও মহিমা বহন করে, যাতে প্রাচীন ধর্মীয় মূল্যবোধের চিহ্ন খুঁজে পাওয়া সম্ভব।' –এলিয়াদে, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫১।